9/6/09

৫

প্রতিধ্বনি

বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা

ললিত চন্দ্র ভরালী মহাবিদ্যালয়
মালিগাঁও, গুয়াহাটী
২০০৯

প্রতিধ্বনি
বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা
ললিত চন্দ্র ভৰালী মহাবিদ্যালয়
মালিগাঁও, গুয়াহাটী-৭৮১০১১

ষষ্ঠ প্রকাশ ঃ
মে' ২০০৯

ডি.টি.পি. ঃ কুমুদ কলিতা

ছাপা ঃ
অফ্‌ছেট ডিজাইন ইণ্ডিয়া
বাটা বিল্ডিং, মালিগাঁও চারিআলি
গুয়াহাটী-৭৮১ ০১১

OFFICE OF THE PRINCIPAL
LALIT CHANDRA BHARALI COLLEGE
Maligaon, Guwahati-781011, Assam, (India)
Ph. : (0361) 2570465, 2675259, Fax : 0361-2570465

Dr. N. K. Deka, M.Sc., Ph.D.
Principal & Secretary
Ref. :..... *Date* :.....

শুভেচ্ছা বাণী

ললিত চন্দ্র ভৰালী মহাবিদ্যালয়ৰ বাঙলা বিভাগৰ মুখপত্র 'প্রতিধ্বনি' ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশৰ আয়োজন কৰা বুলি জানিব পাৰি সন্তোষ পোৱাৰ লগতে গৌৰৱ বোধ কৰিছোঁ। এই মুখপত্রৰ জৰিয়তে মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী তথা ছাত্র-ছাত্রীসকলে তেওঁলোকৰ সৃষ্টিকর্ম বিকাশৰ লগতে সমাজৰ বৌদ্ধিক দিশলৈ অৰিহণা যোগাব বুলি আশা কৰিলোঁ।

ইতি—

স্বাক্ষৰ—
ড০ নিশিকান্ত ডেকা
অধ্যক্ষ

২৩ মার্চ,২০০৯

—ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ—

মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ড০ নিশিকান্ত ডেকা মহাশয়কে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের ষষ্ঠ সংখ্যা 'প্রতিধ্বনি'কে শুভেচ্ছাবাণী জানাবার জন্য। কর্তৃপক্ষের সবল নেতৃত্ব এবং একই পরিবারে সংঘবদ্ধ হয়ে থাকা শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, কর্মচারী, ছাত্র-ছাত্রীদের দায়বদ্ধতার জন্য আমরা আজ ছয় বছর ধরে সাহিত্য পত্রিকাটি প্রকাশ করতে পারছি। সর্বশেষে অফ্‌ছেট ডিজাইন ইণ্ডিয়া প্রেছের স্বত্বাধিকার, কর্মচারী এবং শ্রীকুমুদ কলিতাকে ছাপার কাজের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। 'প্রতিধ্বনি' বাংলা বিভাগ, মহাবিদ্যালয়ের প্রতি দায়িত্ব পালন করার এক প্রতিশ্রুতি।

—প্রতিধ্বনি সম্পাদনা সমিতি

প্রস্তাবনা

পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে কারণে অকারণে মারামারি, কাটাকাটি, হত্যালীলা, রক্তপাত, যুদ্ধবিগ্রহ যেন প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে ঘটে চলছে। আজ সভ্য বলে দাবী করা মানুষও প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করছে নিজের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে, দেশ-পরদেশ সর্বত্র— যেখানেই তার শ্যেন দৃষ্টি পড়ছে। আদিম যুগে হানাহানি হতো অধিকার সাব্যস্ত করার দাবীতে। আমাদের মহাকাব্য রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডিসি মূলতঃ যুদ্ধেরই কাহিনী, সেখানে লোভ, হিংসা-প্রতিহিংসা, নারীহরণ, রাজ্যদখলের লড়াই, কিন্তু সেখানে বিনাকারণে বা বিনাবিচারে নিরীহ প্রজা নারী বা শিশুর নির্যাতন হয়নি।

বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যার শীর্ষে উঠে মানুষ একদিকে সমগ্র পৃথিবীতে আমূল পরিবর্তন এনেছে, অন্যদিকে উগ্রপন্থী বা সন্ত্রাসবাদীরা নারী-শিশু, নিরীহ মানুষদের যথেচ্ছভাবে হত্যা করে ধ্বংস লীলা চালিয়ে যাচ্ছে। লোভী রাষ্ট্রনায়করা পর-রাজ্যকে হাতের মুঠোয় রাখার নেশায় নীতিবোধ, বিবেক বিসর্জন দিয়ে বর্বরোচিত আচরণ করছে।

এভাবে কোনঠাসা হয়ে প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে বেঁচে থাকার নামতো জীবন নয়— এই পরিস্থিতি থেকে রেহাই পাবার উপায় জনজাগরণ। জনজাগরণের একটি মাধ্যম হল সাহিত্যচর্চা, এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে বাংলা বিভাগের মুখপত্র 'প্রতিধ্বনি'র ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশিত হল। এই প্রয়াস মহাসাগরের বুকে একবিন্দু বারিকণা সম হলেও আমরা আশা রাখি হয়তো পথভ্রষ্ট কোনো একজনকেও এই প্রচেষ্টা সত্য সুন্দর ও মঙ্গলের পথে অগ্রসর হবার অনুপ্রেরণা জাগাবে।

ইতি—

ড০ সুনন্দা দাশ
মুরব্বী অধ্যাপিকা
বাংলা বিভাগ

সূচীপত্র

☛ ধর্মের মূলকথা চৈতন্যের উদ্বোধন	ঃ রঞ্জনা সেন	৫
☛ লক্ষ্মী লাভের মন্ত্র ঃ শ্রম	ঃ ডঃ মীনাক্ষী দেবী	৭
☛ বর্তমান প্রজন্ম ও সন্ত্রাসবাদ	ঃ সুদীপা ভট্টাচার্য্য	৮
☛ জীবন যুদ্ধ	ঃ পায়েল ধর	১১
☛ প্রকৃতি প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ ঃ ছোটগল্পের প্রেক্ষিতে	ঃ শিবানী দে	১২
☛ বিবর্তন (মূল লেখক ঃ শীলভদ্র)	ঃ অনুবাদ ঃ ড০ সুনন্দা দাস	২৩
☛ একাত্ম অনুভব	ঃ মলিনা চৌধুরী	২৬
☛ আঁধার	ঃ সুনন্দা দাস	২৯
☛ যদি ঘুম না আসে	ঃ অরুনাভ ঘোষ	২৯
☛ আমার বাসনা	ঃ পাপড়ি দে	২৯
☛ প্রণাম জানাই	ঃ সুনীতা দত্ত	৩০
☛ নিরালার কবিতা	ঃ শরদিন্দু চৌধুরী	৩০
☛ ভোমরা	ঃ প্রিয়ঙ্কা চৌধুরী	৩১
☛ তুমি	ঃ শরদিন্দু চৌধুরী	৩১

ধর্মের মূলকথা চৈতন্যের উদ্বোধন

—*রঞ্জনা সেন*
বিভাগীয় প্রধান,
অর্থনীতি বিভাগ

অনন্ত চেতনা, অনন্ত প্রাণশক্তি। এই অনন্ত, অখণ্ড প্রাণশক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে আছে, ছড়িয়ে আছে সর্বঘটে। এই ছড়িয়ে থাকা অসীম, অখণ্ড, অনন্ত প্রাণশক্তির সম্মিলিত রূপ হ'লো পরমব্রহ্ম। 'অনন্ত চেতনা'— এখানে আমার বা তোমার আলাদা আলাদা কোনো চেতনার প্রশ্ন আসেনা। সবই অখণ্ড ও অনন্ত। একটা তেঁতুল গাছে অজস্র ছোট ছোট পাতা-ডাল থাকে। সব পাতা-ডাল প্রাণশক্তি পাচ্ছে মূলতঃ তেঁতুল গাছটার থেকে। তেঁতুল গাছটিই মূলতঃ প্রাণশক্তি ছড়িয়ে দিচ্ছে তার প্রত্যেকটি ছোট ছোট পাতা ও ডালের কোণায় কোণায়। ঠিক তেমনি অখণ্ড চৈতন্য বা পরমব্রহ্ম ছড়িয়ে আছেন সর্বত্র, আমাদের সবার মধ্যে। কিন্তু আমরা তা উপলব্ধি করতে পারিনা। তাই আমি-তুমি, আমার-তোমার এই ভাবে আমরা বহুধা বিভক্ত হয়ে থাকি। ভুলে যাই আমরা সবাই পরমব্রহ্মের ছড়িয়ে থাকা এক একটি কণা মাত্র। আমাদের এই অজ্ঞানতাই আমাদের বুঝতে দেয় না যে, তোমার ধর্ম আমার ধর্ম বলে কিছু নেই। সনাতন ধর্ম হ'ল প্রেম, যেখানে ত্যাগ, স্বার্থশূন্যতা, অহিংসা, সত্যানুরাগ, সমন্বয় ও অসাম্প্রদায়িকতা বিরাজমান।

আজ থেকে বহুবছর আগে শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন 'মতুয়ার বুদ্ধি' করোনা। কারণ মতুয়ার বুদ্ধি হ'ল যত অনর্থর মূল। 'মতুয়ার বুদ্ধি' কি? আমার মতই সত্য, আমার পথই পথ, আমার কথাই কথা। আর সবমত, সব পথ, সব কথা মিথ্যা, ভ্রান্ত ও অসার। শাক্ত, শৈব এবং বৈষ্ণব প্রত্যেকে বলছে তার পথই পরমব্রহ্ম লাভের একমাত্র পথ। হিন্দু বলছে, আমার মন্দিরেই শুধু ঈশ্বরের অবস্থান। মুসলমান বলছে, আমার মস্‌জিদই উপাসনার শ্রেষ্ঠ স্থান, খ্রিষ্টান বলছে, আমার গির্জাই স্বর্গস্থ পিতার একমাত্র আবাস। এই 'আমি', 'আমার' এসব মত নিয়ে আত্মম্ভরী মতান্ধতাকেই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'মতুয়ার বুদ্ধি'। ঠাকুরের এই উক্তির প্রাসঙ্গিকতাকে উপেক্ষা করার

আজ কোন উপায় নেই। কারণ এই 'মতুয়ার বুদ্ধি' থেকেই জন্ম নিচ্ছে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা, যার পরিণতি সন্ত্রাস, হিংসা, রক্তপাত, বিদ্বেষ, ও নাশকতায়। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের সতর্ক করেছিলেন এই বলে যে, সাম্প্রদায়িকতা এবং মৌলবাদের বেড়াজালে ধর্মধ্বজীরা ধর্মকে আটকে ফেলে এবং ধর্মকে এরা করে বিপণনের সামগ্রী। তাদের কাছে ধর্ম হয়ে ওঠে সন্ত্রাস, বিভীষিকা। অথচ ধর্মের এক্ষণে কোনো ভূমিকা নেই। আমাদের ঋষিরা বলেছেন, যা মানুষকে ধারণ করে, সমাজকে ধারণ করে রাখে, রক্ষা করে, মানুষে মানুষে বিভেদ দূর করে— তাই ধর্ম। ধর্ম কথাটি এসেছে সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতু থেকে। 'ধৃ' ধাতুর অর্থ ধারণ করা, রক্ষা করা। ধর্ম আচরণে, ধর্ম হৃদয়ের ব্যাপ্তিতে, সাম্প্রদায়িকতার শৃঙ্খলামুক্তিতে, ধর্ম সমন্বয়ের আদর্শের অনুশীলনে। আমাদের অজ্ঞানতা আমাদের শৃঙ্খলমুক্ত হতে দেয়নি, তাই আমাদের প্রতিটি বিন্দুতে মিশে আছে দ্বিচারিতা, হিংসা, স্বার্থপরতা ও ঘৃণা। শ্রীরামকৃষ্ণ সব জানতেন তাই তিনি আমাদের শৃঙ্খলমুক্ত করতে চেয়েছেন, আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন যে ধর্মের মূল কথা চৈতন্যের উদ্বোধন, অজ্ঞতা থেকে উত্তোলনে এবং মনুষ্যত্বের উত্তরণে। তিনি যা বলেছেন তা শুধু কথার কথা ছিল না এ ছিল তাঁর জীবনের উপলব্ধি। এই চৈতন্যের উদ্বোধন করার জন্যই হয়তো আজ থেকে বহুবছর আগে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ সকল গৃহস্থ ভক্তদের বলেছিলেন 'তোমাদের চৈতন্য হোক'।☯☯

মহৎ বাণী ঃ

দুটি জিনিষ অসীম— অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও মানুষের নিবুদ্ধিতা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত রূপ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই, কিন্তু নিবুদ্ধিতা যে অনন্ত— অসীম সে বিষয়ে আমার তিলমাত্র সন্দেহ নেই।

—আইনষ্টাইন

লক্ষ্মী লাভের মন্ত্র ঃ শ্রম

—ডঃ মীনাক্ষী দেবী
অসমীয়া বিভাগ

লক্ষ্মীদেবীর স্থান দূর্গা দেবীর দক্ষিণে অর্থাৎ ইনি যে শক্তির প্রতীক তা দক্ষিণাচারেই লভ্য। কে না জানে, জ্ঞান আর ঐশ্বর্য্য সেই পরাশক্তিরই দাক্ষিণ্যের মূর্ত প্রকাশ।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্ধং কৃষিকর্মাণি
তদর্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।।"

—পূর্ণভাবে লক্ষ্মীলাভ হয় বাণিজ্য করলে। তার অর্ধেক লাভ হয় কৃষিকর্ম করলে, তার এক চতুর্থাংশ লাভ হয় রাজসেবায়। কিন্তু ভিক্ষায় কিছুই লাভ হয় না। কিন্তু কি বাণিজ্য, কি কৃষিকর্ম, আর কি রাজসেবা, যে জীবিকাই গ্রহণ করা হোক, বিনা পরিশ্রমে কোন কিছু লাভ হয় না। তাই দেখি বর্তমান যুগের অর্থনীতিবিদরা সবাই একবাক্যে স্বীকার করেন— শ্রমই হচ্ছে ধনোৎপাদনের মূলীভূত কারণ। এই শ্রম সম্পর্কে 'জ্ঞানতন্ত্রে' বলা হয়েছে—

"শ্রমাধীনং জগৎ সর্বং
শ্রমাধীনশ্চ দেবতা।
শ্রমাধীনং মহামন্ত্রং
শ্রমধীনং পরন্তপ।।"

—সমস্ত জগতই হচ্ছে শ্রমের অধীন, সমস্ত দেবতা, সমস্ত মহামন্ত্র, সমস্ত শ্রেষ্ঠ তপস্যাও শ্রমসাধ্য।

পুরাণের উপাখ্যানে দেখা যায়, দুর্বাসার অভিশাপে ইন্দ্রকে লক্ষ্মী ছেড়ে গেলেন। তখন লক্ষ্মীকে উদ্ধার করার জন্য পরম উদ্যমে সংহত হলেন দেবতাগণ ও অসুরগণ। শুরু হল বিপুল পরিশ্রমে সমুদ্রমন্থন। তারই ফলে হারানো লক্ষ্মীকে আবার ফিরে পেলেন ইন্দ্র। এর থেকেই বোঝা যায়, কতটুকু শ্রমের মূল্যে লক্ষ্মীকে লাভ করা যায়। সেইজন্যই লক্ষ্মীকে 'বিজয়া' নামে অভিহিত করা হয়।

পুরাণের উপাখ্যানেই জানা যায় যে লক্ষ্মী সমুদ্রের কন্যা— অর্থাৎ সমুদ্রগামী বণিকরাই তাঁর কৃপা সমধিক লাভ করে। আর এও জানা যায় যে লক্ষ্মী হলেন অপস্তত্বের প্রতীক। আবার চতুর্বর্গের দ্বিতীয় যে অর্থ লক্ষ্মী তারও প্রতীক বটে। সুতরাং; যে দিক থেকেই বিচার করা যাক না কেন, লক্ষ্মী লাভের মূলমন্ত্র হল শ্রম।☯☯

বর্তমান প্রজন্ম ও সন্ত্রাসবাদ

—সুদীপা ভট্টাচার্য্যি

"যুদ্ধ মানেই শত্রু শত্রু খেলা, যুদ্ধ মানেই তোমার প্রতি আমার অবহেলা" —এই অসাধারণ সংবেদনশীল লাইনটি কেবল বইয়ে-পুস্তকেই সীমাবদ্ধ থেকে গেলো। হ্যাঁ, সত্যিই তা-ই। কে পড়বে এমন লাইন এখন? কার বা এতো সময় আছে কবিতা কিংবা সাহিত্য পড়ার? আজকের প্রজন্মের কাছে সাহিত্য একটা কিম্‌ভূতকিমাকার বিষয়। ক্যারিয়ারের ইদুঁর দৌড়ে Job oriented course-এর চাহিদায় সাহিত্য আজ একঘরে হয়ে পড়েছে। হয়তো বা মহাকাল চক্রের আবর্তে এই বিষয়কে সকলেরই মেনে নিতে হচ্ছে। ফলশ্রুতির স্বরূপ ভুলতে বসেছি আমরা আমাদের সংস্কৃতি, সভ্যতা সবকিছুই। বিদেশিয়ানার দৌলতে অত্যাধুনিক হয়ে পড়েছে এই প্রজন্ম। কিন্তু এই অত্যাধুনিকতা যে ধীরে ধীরে আমাদের মনুষ্যত্বকে গ্রাস করতে চলেছে এক কালব্যধির মতো— তা এই আধুনিক প্রজন্ম হয়তো একেবারেই বুঝতে পারছেনা। সময় নেই মনুষ্যত্ব বোঝার। কে কাকে চেনে আজ? 'চাচা আপন প্রান বাঁচা কিংবা আপনি বাঁচলে বাপের নাম" —এই মানসিকতার ফলেই সকলের একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে এলো নিউক্লিয়র ফ্যামিলি, বাড়ি ভেঙে এলো নির্দিষ্ট সীমার ফ্ল্যাট, অবসর বিনোদন মানে দশজনের সঙ্গে আনন্দ নয়, একা নিজের নিউক্লিয়র ফ্যামিলির চাহিদায় রেস্টুরেন্ট, পার্ক, কিংবা ডিস্কোতে কাটানো। এভাবে সংকীর্ণতা বাড়তে বাড়তে ছড়িয়ে পড়ছে সমাজে, ফলে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নিরপেক্ষ দেশ ভারতবর্ষে জাত-ধর্ম-বর্ণের নামে চলছে ঢিল ছোড়াছুড়ি, জ্বলছে বহু ঘর, পুড়ছে বহু মানুষ। আমরা আমাদের নিজেদের বাঁচাতে গিয়ে নিজের ঘরের মধ্যেই ডেকে এনেছি ভেদাভেদ। ফলে ছোটবেলার থেকেই গড়ে উঠছে একাকী থাকার মানসিকতা। এই মানসিকতা বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায় নিয়েছে যে আজকের প্রজন্ম (কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্যই) নিজের মা-বাবাকেও তোয়াক্কা করেনা। ক্যারিয়ার সর্বস্বতা একদিকে বাড়ছে, পাশাপাশি বাড়ছে একের প্রতি অন্যের ঘৃণা। এতো সংকীর্ণতা যে দেশে সেখানে তো সন্ত্রাসবাদের বীজানু

মাথাচাড়া দিয়ে উঠবেই। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া গুয়াহাটির নারকীয় বোমা বিস্ফোরণ ও মুম্বইয়ে সন্ত্রাসবাদী আক্রমন তার জ্বলন্ত প্রমান। কার এখন এতো সময় আছে এই ঘটনা নিয়ে বেশি নাড়াঘাটা করার? আর কেনই বা করবে? সরকার উগ্রপন্থী সন্দেহে প্রচুর লোককে ধর-পাকড় করছে, জেরা করছে, ভান করছে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার, মিডিয়া ফলাও করে দেখাচ্ছে বিস্ফোরণে আহতদের কিংবা নিহতদের পরিবারের যন্ত্রণা। গুয়াহাটি জুড়ে হয়েছে শান্তি মিছিল, নিহতদের আত্মার সদ্‌গতির কামনায় জ্বলেছে প্রচুর মোমবাতি। বিরোধী দলের নেতারা সরকারকে গদিচ্যুত করে এবং অবশ্যই নিজে ক্ষমতায় আসতে বন্ধ ডেকেছে, মিছিল করেছে, মুখভরে ভাষণ দিয়েছে। আবার কি করবে? ব্যস্ হয়ে গেছে, একরকম ভোট ক্যাম্পেনিং হয়ে গেছে বলা যেতে পারে। এখন আবার সব নিজেদের জীবনে ফিরে গেছে। আজ আর কেউ আমরা ভাবছিনা বোমা বিস্ফোরণে আহত বা নিহতদের নিয়ে। হ্যাঁ এটার নামই আধুনিক জীবন। 'সকলের তরে সকলে আমরা' —এ মানসিকতা আজকাল back-dated। কিন্তু কেন এতো মনুষ্যত্বহীনতা? এর শেকড় খুঁজি কি আমরা? এর শেকড়ে এক একজনের পরিবার। মা-বাবা আর সন্তানের পরিবারের মা ও বাবা দুজনেই চাকরি করেন। সন্তানকে সময় নাকি দিতে পারেন না। ফলে এই অপরাধবোধ মেটাতে তাঁরা সন্তান আর যা যা চায় সমস্ত চাওয়ার আগেই হাতে পৌঁছে দেন। ফলে এভাবে পেতে পেতে না পাওয়ার যন্ত্রণা এরা সহ্য করতে পারে না। এদের চাওয়াটা কেবল নিজের সুখ-ভোগের সামগ্রীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। আর তা না পেলেই আসে বিদ্রোহী মনোভাব। যেহেতু তারা বোঝে না জীবনটা এতো সহজ নয়, ফলে তারা জীবনে সবকিছুকে জিতে নিতে চায়। কিন্তু আদপে তা হয় না। তবে এ দোষটা শুধু অভিভাবক বা এ প্রজন্মের তা-ই নয়। আমাদের সরকারও অনেকাংশে এর জন্যে দায়ী। সরকার নিজের গদি বজায় রাখতে বেকার সমস্যাকে মিটতে দেয় না। তারা চায়না একশো শতাংশ চাকরি। কারণ কিছু ছেলেকে হাতে রাখতে হবে। নিজের ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখতে এ প্রজন্মের চেয়ে বড়ো কোনো ঢাল নেই। তাই তো কিছু পয়সা ফেলছে এদের সামনে আর কিনে নিচ্ছে মন-প্রাণ-মস্তিষ্ক সব। ফলে বেকার সমস্যা বাড়ছে। এতো গেল শহরের কথা। আর গ্রামের অবস্থা তো আরও শোচনীয়। ভারতবর্ষে গ্রামই যেহেতু বেশি, ফলে গ্রামের ছেলেদের কায়দা করে হাতে রাখে সরকার। অশিক্ষা, অভাবের গ্রামে ভোটের সময় টাকা ফেলে সমস্ত রাজনৈতিক দল আপন দলে লোক

টানতে চায়। ভোটও শেষ হয়, গ্রামের মানুষের প্রতি শেষ হয় সহানুভূতিও। ফলে ভারত আজও তৃতীয় শ্রেণীর দেশ হয়েই থাকে। কিন্তু কেন ভারত তৃতীয় শ্রেণীর দেশ হয়ে আছে? এ প্রশ্ন আসতে হবে এই আধুনিক প্রজন্মের মাথায়। তার জন্য নিজেকে সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করতে হবে। ক্যারিয়ার বানানোর সঙ্গে নিজেকে ভারতের দায়িত্বশীল নাগরিক বলে ভাবতে হবে। যে দেশের নাগরিক দেশের প্রতি নিজের দায়িত্ব অনুভব করবে, সে দেশের সরকারও তখন বাধ্য হবে দেশকে নতুন করে গড়তে। আর এমন দেশে সন্ত্রাসবাদও পারবে না ঘাঁটি গাড়তে।

সুতরাং, সন্ত্রাসবাদ নামক এই কালব্যাধি নির্মূল করার দায়িত্ব এ প্রজন্মকেই হাতে তুলে নিতে হবে। হয়তো তখনই ভারতে আবার শান্তির ভোর আসবে।☯☯

মহৎ বাণী ঃ

বন্ধুর থেকে ধার নেবার আগে বন্ধুটি আপনার কাছে অধিক প্রয়োজনীয় না ধনের প্রয়োজন অধিক সে সিদ্ধান্ত আগে নিন।

—আমেরিকান প্রবচন

জীবন যুদ্ধ

—পায়েল ধর

প্রতিনিয়ত মানুষ পৃথিবীতে যুদ্ধ করে চলছে আর সেইসঙ্গে জীবনকে জয় করার চেষ্টা চলছে। এই যুদ্ধ নানা ধরণে, নানা কারণে ঘটে চলছে। কেউবা ধনের জন্য, কেউ বা মানের জন্য, কেউ বা খাদ্যের জন্য, কেউ বা বেঁচে থাকার জন্য প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে চলছে। যারা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এই যুদ্ধে নামে বা কর্ম করে তারাই জয়ী হয়। সবাই এই সংগ্রামে জয়ী হতে পারে না, কারণ সবার মধ্যে সংগ্রাম করার সাধ্য বা শক্তি থাকে না। তাই তাদের জয়ী হবার সম্ভাবনাও খুব কম। এবং সেসব পরাজিত মানুষের সংখ্যাই পৃথিবীতে বেশী।

আজ পৃথিবীর মানুষরা সবাই নিজের নিজের জগতকে নিয়ে, নিজেকে নিয়ে এত ব্যস্ত যে অন্য কারো প্রতি নজর দেবার সময় নেই। এমনকি অনাহারে মরে যাওয়া মানুষের প্রতিও কারো সহানুভূতি জাগে না। অবিরত নিজের সুখের পথকে প্রশস্ত করার কাজে মানুষ নিজের সময়কে ব্যয় করতে ভালোবাসে। এতেই বোঝা যায় মানবতাবোধ, নীতিবোধ ইত্যাদি আজ কেবলমাত্র পুঁথির শব্দ। কিন্তু এসব ছাড়া কি সত্যিকারের মানুষ গঠিত হতে পারে? এখনো সময় আছে, আমরা যদি এখনই সেসব প্রশ্নের উত্তর না খুঁজি, তাহলে আমাদের জীবনও ব্যর্থ হয়ে যাবে। জীবন সংগ্রাম করে এগিয়ে গেলেও, মনুষ্যত্ববোধকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

আজকাল মানুষের মনে প্রকৃত দয়া বা বন্ধুত্ব-এর কোনোটিরই স্থান নেই। বন্ধুত্বের পেছনেও স্বার্থপরতা কাজ করে, কারণ প্রবল বন্ধুত্ব থাকার পরও যদি কেউ কারো স্বার্থে আঘাত করে তাহলে সেই বন্ধুত্ব শত্রুতায় পরিণত হতে বেশী সময় লাগেনা। এভাবে চলতে থাকলে পৃথিবীতে মনুষ্যত্বকে টিকিয়ে রাখা যাবে না। এই যে হিংসা, দ্বেষ, রেষারেষিবোধ— সব কিছুর পেছনেই কারো না কারো ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা লুকিয়ে থাকে।

মানুষের মনে প্রেম, ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা ইত্যাদি নাথাকলে মানুষ ও পশুর মধ্যে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। তাই একে অন্যের প্রতি ভালোবাসার ভাব রাখতে হবে, বন্ধুত্বকে স্বার্থপরতার শৃংখল মুক্ত করতে হবে। সব সময় নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত না থেকে অন্যের কথাও ভাবতে হবে। তাহলেই পৃথিবীতে শান্তি আসবে বলে আমি মনে করি।☯☯

প্রকৃতি প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ ঃ ছোটগল্পের প্রেক্ষিতে

শিবানী দে
বাংলা বিভাগ

প্রকৃতিকে ছাড়া সাহিত্যকে কল্পনা করা যায় না, প্রাচ্য পাশ্চাত্য যেদিকেই দেখি না কেন, সকল সাহিত্যে প্রকৃতি কোন না কোন ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ স্থান লাভ করেছে। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ থেকেই প্রকৃতিকে অবলম্বন করে সাহিত্য রচিত হয়ে আসছে। তবে চর্যাকাররা চর্যাপদে প্রকৃতিকে চিত্রিত করার জন্যে প্রকৃতিকে ব্যবহার করেননি। তাঁরা তাঁদের পদে প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছিলেন কায়াসাধনার গুঢ় তত্ত্বকে অদীক্ষিতের হাত থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য। বৈষ্ণব পদাবলীতেও প্রকৃতি বর্ণনা আছে, প্রকৃতি এখানে উদ্দীপন বিভাব হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের পটভূমিকা রচনা করেছে। তবে সখীদেরকে ছাড়া যেমন রাধা কৃষ্ণের প্রেমের স্ফূর্ত্তি ঘটেনা, ঠিক তেমনি প্রকৃতি ছাড়াও এই প্রেমের পূর্ণ বিকাশ ঘটেনা। বৈষ্ণব পদাবলীর পাশাপাশি গ্রামবংলায় রচিত ময়মনসিংহগীতিকা, পূর্ববঙ্গগীতিকা ইত্যাদি গাথা সাহিত্যের কাহিনীগুলোতে পল্লী প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ তা আশ্চর্য সুর সঙ্গতিতে প্রতিভাত হয়েছে। এই রচয়িতারা যে গভীরভাবে প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তার প্রমাণ গাথা সাহিত্যগুলিতে বর্তমান।

এরপর উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত গীতি কবিতা গুলির দিকে একটু নজর দেওয়া যাক। এই সময় প্রকৃতিকে নিয়ে রচিত কবিতা গুলি পাশ্চাত্য কবিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। মধ্যযুগে রচিত সাহিত্যে প্রকৃতিকে পেলেও সে সকল সাহিত্যে পাওয়া যায় প্রকৃতির বহিরঙ্গ রূপ। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল কবি প্রকৃতি বিষয়ক সার্থক গীতিকবিতা রচনা করেছিলেন তাঁদের কবিতার মধ্যে একটা মানবীয় চেতনা অনুভব করা যায়। নিসর্গ বা প্রকৃতিও যে কবিতার বিষয়বস্তু হতে পারে, তার স্বীকৃতি পাওয়া যায় এই সময়ে রচিত কবিতাগুলির মধ্যে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রকৃতি বিষয়ক গীতিকবিতা গুলির মধ্যে দেখা যায় বিশুদ্ধ পাশ্চাত্য

রোমান্টিকভঙ্গী। এই সময়ের বিখ্যাত কবি হলেন বিহারীলাল চক্রবর্তী। তাঁকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যজীবনের গুরু রূপে মেনে নিয়েছিলেন। কবি বিহারীলাল প্রকৃতিতে কেবল আনন্দের সন্ধান করেননি, প্রকৃতিকে চৈতন্যদান করে তাকে হৃদয় বেদনাও জানিয়েছেন। কোথাও কোথাও কবি প্রকৃতিকে মানবী রূপেও কল্পনা করেছেন।

বিহারীলালের ভাবশিষ্য, রবীন্দ্রনাথের হাতে প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা নবীন অর্থগৌরবে, নবতর, ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হয়েছে। পূর্ববর্তী কবিদের প্রকৃতি উপাসনার সকল সুফল উত্তরসূরী রবীন্দ্রনাথের কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। বিহারীলালের কবিতায় যে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, সেখান থেকেই বাংলা কবিতার রোমান্টিক বিষাদের যাত্রারম্ভ। তাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের রচিত কাব্যগুলি রোমান্টিক বিষাদের লক্ষণাক্রান্ত। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেম সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাক রবীন্দ্র যুগের প্রকৃতিপ্রেম সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রীতিকে কতটুকু প্রভাবিত করেছিল, সে সম্পর্কে দু-চারটি কথা বলব।

'ভারতীয় সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক রবীন্দ্রনাথ'কে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল, সেই প্রভাবই তার কবি মানসিকতাকে গড়ে তুলেছিল, যে কবি মানসিকতা শুধু তার কাব্যগুলোকেই নয়, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ছাড়াও অন্যান্য গদ্যসাহিত্যকেও রসসিক্ত করেছিলো। কোনো এক দেশের সংস্কৃতি রূপায়িত হয় সে দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জলবায়ুর দ্বারা। নদীমাতৃক বাংলার সংস্কৃতি গড়ে উঠছে সবুজ, শ্যামল গাছপালা ইত্যাদি দিয়ে রচিত প্রাকৃতিক পরিবেশের সহায়তায়, অপরদিকে রাজস্থানের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে ধূ ধূ করা বালি নিয়ে রচিত উষর মরু অঞ্চলকে ভিত্তি করে। দুটি জায়গাই ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হলেও প্রাকৃতিক পরিবেশের দিক দিয়ে আকাশ পাতাল তফাৎ। সুতরাং সংস্কৃতি গড়ে উঠার পেছনে প্রাকৃতিক পরিবেশের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সাহিত্যও সংস্কৃতিরই একটা অঙ্গ। রবীন্দ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠার পেছনেও বাংলাদেশের কয়েকটি অখ্যাত পল্লীঅঞ্চল, পদ্মানদীর ভূমিকা অনস্বীকার্য্য।

ইসলামী বা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি প্রবেশের পূর্বে ভারতীয় সংস্কৃতির এক উর্বর রূপ পরিলক্ষিত হয় ঋক্‌বেদ থেকে শুরু করে উপনিষদ, পুরাণ, কালিদাসের রচনা, রামায়ণ, মহাভারত, গীতগোবিন্দ, বৌদ্ধসাহিত্য ইত্যাদিতে। এসকল সাহিত্যে ভারতীয় সংস্কৃতির এক বলিষ্ঠ পরিচয় স্পষ্ট প্রতীয়মান। রবীন্দ্র মানসিকতা গড়ে উঠার পেছনে এই সময়ে রচিত সাহিত্যের অবদান অনস্বীকার্য্য। তবে পাশ্চাত্য সাহিত্যও তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

রবীন্দ্র সাহিত্য অধ্যয়ন করলেই বোঝা যায়, তার জীবনদর্শনের প্রায় প্রতিটি স্তরে আছে প্রাচীন ও নবীনের সমান প্রভাব— যার প্রতিফলন কোন না কোন ভাবে তার প্রতিটি রচনায় দেখা যায়। প্রাচীন সাহিত্য বিশেষ করে কালিদাস ও উপনিষদের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের কাব্যে-গানে, কর্মে ও চিন্তায়, নানারূপে, নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে। প্রকৃতির ক্ষেত্রে কালিদাস ও জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে উপনিষদ কবিকে বহুভাবে প্রভাবিত করেছে। কবির শৈশবকালকে সমৃদ্ধ করেছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর ঔপনিষদিক আবহাওয়া। তবে উপনিষদের ধর্ম তার কাছে ছিল একটা অনুভূতির বিষয়, যে অনুভূতি তার সমগ্র জীবন, সমস্ত সাহিত্যকেই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন গীতিকবি, শুধু কবিতার ক্ষেত্রেই যে তার গীতিকবির প্রতিভা উন্মোচিত হয়েছিল তা নয়, তার ছোটগল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস এমনকি চিঠিপত্রও গীতিকবিতার লক্ষণাক্রান্ত। গীতিকবিতার অধিকাংশই অব্যক্ত, তার খণ্ডের মধ্যেই পূর্ণতা, ঠিক তেমনি ছোটগল্পেও একটা খণ্ড অংশের ঘটনা বর্ণনা করা হয় এবং তা শেষ হয়েও শেষ হয় না। আমরা জানি ১২৯৮ থেকে ১৩১০- এই ১২ বৎসর কাল কবির কাব্যরচনার স্বর্ণযুগ। এসময় সকল কাজ, সকল অভিজ্ঞতার মধ্যে এক অপূর্ব বিস্ময়কর সৌন্দর্য্যবোধ, সৃষ্টির প্রতি তার এক অপূর্ব ভালোবাসা তাঁর কবিতাগুলোতে বার বার প্রকাশ পেয়েছে। এইসময় কবি জমিদারী দেখাশোনার কাজ নিয়ে পূর্ববাংলার সাজাদপুর, শিলাইদহ- এসব জায়গায়. নদীর উপর নৌকায় ভেসে ভেসে দিন কাটাচ্ছেন। বাংলাদেশের নির্জন প্রান্ত, তার নদীতীর, উন্মুক্ত আকাশ, বালুর চর, ছায়া সুনিবিড় গ্রাম, সহজ অনাড়ম্বর পল্লীজীবন তাকে আকৃষ্ট করল। পদ্মার দুই পারের প্রকৃতি এবং তৎসন্নিহিত পল্লীর জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে কবি প্রত্যক্ষ করলেন। প্রকৃতি ও মানুষের মিলনেই যে জীবনের পূর্ণতা, একথা ও তিনি গভীরভাবে অনুভব করলেন। গ্রামের মানুষ এবং তাদের জীবনকে এত গভীরভাবে ভালোবাসার মধ্যে কবির যে চরিত্রগত ঔদার্য্য ও মহত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তার তুলনা খুব কমই আছে।

একবার নদীকল্লোলিত শ্যামবাংলায় বসে কবি লিখেছিলেন— "এই যে ছোটনদীর ধারে শান্তিময় গাছপালার মধ্যে সূর্য্য প্রতিদিন অস্ত যাচ্ছে এবং এই অনন্ত ধূসর নির্জন নিঃশব্দ চরের উপর প্রতিরাত্র শতসহস্র নক্ষত্রের অভ্যুদয় হচ্ছে, জগৎসংসারে এ কী একটা আশ্চর্য্য মহৎ ঘটনা, তা এখানে থাকলে তবেই বোঝা যায়।" এই পল্লীবাংলার তরুচ্ছায়াঘন নদীঘনিষ্ঠ গ্রাম্যজনপদের বুক থেকেই তার ছোটগল্পের উপকরণ তিনি সন্ধান করেছেন। উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে প্রকাশ পায় কবির প্রকৃতির

প্রতি অনুভব করা এক নিবিড় একাত্মতাবোধ। গ্রামের প্রতিটি জিনিষের প্রতি এক মমতাময় প্রশান্ত বিশ্বাস। কবি তার অসংখ্য ছোটগল্পে মানবজীবন কাহিনীর পটভূমিতে পল্লীবাংলার শ্যামলিমা, তরঙ্গিত নদী, মেঘাবৃত আকাশ, শস্যপূর্ণ ও শস্যহীন প্রান্তর, কুহুধ্বনিত বসন্ত, জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিকে অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে অপরূপ বর্ণে অংকিত করছেন। তাঁর কবি দৃষ্টিতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের এক অনির্বচনীয় রহস্য উদঘাটিত হয়েছে। এর আগে কোনো গল্পকারের রচনাতেই প্রকৃতি এমন করে প্রাণ পায়নি। কবি প্রকৃতিকে নররূপায়িত করে ছোট গল্পগুলোতে এক নবতর ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করলেন। তাঁর কোনো কোনো গল্পে প্রকৃতি বা নিসর্গ শুধু পটভূমি তৈরী করেই থেমে থাকেনি, সজীবতা লাভ করে কোথাও কোথাও গল্পের পরিণামও নির্ধারণ করেছে, যেমন 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পটি। শিলাইদহের পল্লীপ্রকৃতির নিকট তাঁর ছোটগল্পগুলি কতখানি ঋণী তা রবীন্দ্রনাথের দু-একটি উদ্ধৃতি থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়— "আমার গল্পগুচ্ছের ফসল ফলেছে আমার গ্রাম গ্রামান্তরের পথে ফেরা এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভূমিকায়" অথবা, "অল্পবয়সে বাংলাদেশের পল্লীপ্রকৃতির সঙ্গে যখন আমার চোখে চোখে পরিচয় হয়েছিল তখন প্রতিদিন আমার মনে যে আনন্দের ধারা উদ্‌বারিত হয়েছিল তাই সহজে প্রবাহিত হয়েছিল ঐ নিরলংকৃত সরল গল্পগুলির ভিতর দিয়ে" মানুষ ও প্রকৃতি যে বিচ্ছিন্ন সত্ত্বা নয়, একে অপরের পরিপূরক এই সত্যকে গল্পগুচ্ছের যে সকল ছোটগল্পে কবি চূড়ান্ত সার্থকরূপে অংকিত করেছেন, সেধরণের কয়েকটি গল্পসম্পর্কে আলোচনা করছি।

জড় ও অচেতনের উপর চেতনা দান করে ছোটগল্পের সূচনা পর্বে রবীন্দ্রনাথ যে ছোটগল্পগুলি লিখেছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম হল 'ঘাটের কথা' ছোটগল্পটি। এই গল্পটিতে পাষান ঘাটকে কথকরূপে অংকিত করে কবি তাকে প্রাণদান করেছেন। মনুষ্যসৃষ্ট হলেও এই ঘাট প্রকৃতির একটি অংশ। ঘাটের জবানবন্দীতে বলা যায়— "ভরা গঙ্গা, আমার চারিটি মাত্র ধাপ জলের উপরে জাগিয়া আছে। জলের সঙ্গে স্থলের যেন গলাগলি, তীরে আম্রকাননের নীচে যেখানে কচুবন জন্মিয়াছে সেখান পর্য্যন্ত গঙ্গার জল গিয়াছে।" রবীন্দ্রনাথের লেখনীস্পর্শে এই চিত্রকল্প গুলিই ঘাটকে করেছে জীবন্ত। এই ছোটগল্পতে কুসুমের শৈশব, কৈশোর, তার বিবাহ, তার বিধবা হওয়া, সন্ন্যাসীর আগমন, কুসুমের মানসিক অবস্থা, অবশেষে কুসুমের বাহ্যিক পরিণতির ইঙ্গিতও গল্পকার দিয়েছেন। এই গল্পে কুসুম ও সন্ন্যাসীর করুণ আখ্যান এবং বহমান সময় যেন সুরের ঐক্যচেতনায় মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। নদীর প্রাচীন ঘাটের অনুভবের জগতে অতীত হয়ে যাওয়া সময়ের যে হাহাকার, তাকেই যে কুসুমের

ব্যর্থ জীবনের বেদনা ভাষা দিয়েছে। এর পটভূমিতে রয়েছে যথার্থ পরিবেশ চিত্রণ, যার মূলে রয়েছে কবির নিবিড় প্রকৃতি প্রেম।

অচেতনের উপর চৈতন্যদান প্রসঙ্গে আরো একটি ছোটগল্পের উল্লেখ এখানে করা যায়। সেটি হল 'রাজপথের কথা'। এরও কথক রাজপথ। 'ঘাটের কথা'র ঘাট-এর মতো রাজপথও গতিশীল সময় ও ঘটনার সাক্ষী। এখানে কাহিনীর বিন্যাস না থাকলেও রাজপথের জবানীতে একটি অসফল ক্ষুদ্র প্রেমের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই দুটি ছোটগল্পে যে সংবেদনটি তরুণ গল্পকার ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন তা হল, অতীতকে বর্তমানের উপর দিয়ে আগামী দিনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ছোটগল্পের শিল্পগত দিকটি না দেখলেও রাজপথের আক্ষেপ পাঠকের মনকে অবশ্যই দোলা দিয়ে যায়— 'আজ শত শত বৎসর ধরিয়া আমি কত লক্ষ লোকের কত হাসি, কত গান, কত কথা শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু কেবল খানিকটা মাত্র শুনিতে পাই। বাকিটুকু শুনিবার জন্য কান পাতিয়া থাকি, তখন দেখি সে লোক আর নাই'। এই ছোটগল্পে প্রকৃতির অতি সাধারণ দৃশ্যকেও গল্পকার রাজপথের জবানবন্দীতে করে তুলেছেন সজীব। রাজপথ বলেছে, 'এতটুকু বিশ্রাম নাই যে আমার এই কঠিন শুষ্ক শয্যার উপরে একটিমাত্র কচি স্নিগ্ধ শ্যামল ঘাস উঠাইতে পারি এতটুকু সময় নাই যে আমার শিয়রের কাছে অতি ক্ষুদ্র একটি নীলবর্ণের বনফুল ফুটাইতে পারি।' রাজপথের জবানবন্দীতে আমরা প্রকৃতিপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথকেই খুঁজে পাই।

'পোষ্টমাষ্টার' ছোটগল্পটিতে রয়েছে প্রকৃতির চূড়ান্ত সার্থক ব্যবহার যা শিল্পের দিক দিয়েও হয়েছে অতুলনীয়। এই গল্পের ভিত্তিভূমি হল একটি সামান্য গ্রাম এবং সেই গ্রামের আরো সামান্য এক 'পোষ্টঅফিস'। পোষ্টঅফিসের পরিবেশটি নির্জন কারণ তার পাশেই ছিল পানাপুকুর এবং পুকুরটির চারিদিকে জঙ্গল। এই পরিবেশের নির্জনতাকে আরো ঘনীভূত করে তুলেছে বর্ষাঋতু। জনবিরল গ্রাম অঞ্চলে বর্ষাকালে পথঘাট আরো নির্জন হয়। গল্পে বর্ণিত বর্ষাকালের এক মেঘমুক্ত মধ্যাহ্নের বর্ণনায় পরিবেশটির নির্জনতা অপরূপভাবে ফুটে উঠেছে। রতনের সঙ্গে পোষ্টমাষ্টারের প্রাথমিক আলাপ-পরিচয়ের পটভূমিতে আছে একটি নির্জন সন্ধ্যা— 'যখন অন্ধকার দাওয়ায় একলা বসিয়া গাছের কম্পন দেখিলে কবিহৃদয়ের ঈষৎ হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, তখন ঘরের কোণে একটি ক্ষীণ শিখা প্রদীপ জ্বালিয়া পোষ্টমাষ্টার ডাকিতেন, রতন'। গল্পটির কেন্দ্রে আছে পোষ্টমাষ্টারের পেছনে ফেলে আসা দিনগুলোর অনুভব থেকে সৃষ্টি হওয়া নিঃসঙ্গতাবোধ, অপরদিকে বাবা-মা-ভাই-বোনকে হারানোর ফলে সৃষ্টি হওয়া রতনের নিঃসঙ্গতাবোধ। এই নিঃসঙ্গতার যোগ্য আধার হয়েছে গ্রামাঞ্চলের নির্জন পরিবেশ।

সামাজিক পরিবেশ, শিক্ষা-দীক্ষায় যাদের কোথাও মিল নেই প্রকৃতিই তাদেরকে মিলিয়ে দিল— 'পোষ্টমাষ্টারের হাতে কাজ ছিল না— সেদিনকার বৃষ্টিধৌত মসৃণ চিক্কণ তরুপল্লবের হিল্লোল এবং পরাভূত বর্ষার ভগ্নাবশিষ্ট রৌদ্রশুভ্রস্তূপাকারে মেঘস্তর বাস্তবিকই দেখিবার বিষয় ছিল। পোষ্টমাষ্টার তাহা দেখিতেছিলেন এবং ভাবিতে ছিলেন, এই সময় কাছে একটি কেহ নিতান্ত আপনার লোক থাকিত, হৃদয়ের সহিত সংলগ্ন একটি স্নেহপুত্তলি মানবমূর্ত্তি'। —প্রকৃতি, রতনের মধ্য দিয়া সেই স্নেহপুত্তলিকে পোষ্টমাষ্টারের কাছে নিয়ে এলো।

গ্রামে থেকে পোষ্টমাষ্টার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রতন তখন তার মায়ের ভূমিকা নিয়ে সেবা যত্ন করে তাকে সুস্থ করে তুলল। শ্রাবণেরই এক নির্জন সন্ধ্যায় রোগক্লান্ত পোষ্টমাষ্টার চাকরি ছেড়ে বাড়ি ফিরে যাবার সংকল্পের কথা রতনকে জানালেন। শুনে রতন অনেকক্ষণ নির্বাক হয়ে রইল। রতনের মনের আসন্ন ভয়ংকর নিঃসঙ্গতাকে শ্রাবণের সন্ধ্যা যেন আরো দুঃসহ করে তুলেছিল। বর্ষণমুখর নির্জন পল্লীগৃহে এই দুটি অসমবয়সী প্রাণী মিলে যে এক অনির্বচনীয় সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল— এক মর্মস্পর্শী সকালে এল এই সম্পর্কের বিচ্ছেদের পালা। বিদায়ের সময় যখন ঘনিয়ে এল, রতন পোষ্টমাষ্টারের সমুখ থেকে এক দৌড়ে পালিয়ে গেল। পোষ্টমাষ্টার ধীরে ধীরে নৌকায় উঠলেন— 'যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল-বর্ষা বিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মত চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন, একটি সামান্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল'। আবার প্রকৃতির নির্মম বিধানে পোষ্টমাষ্টারকে ফিরে যেতে হল, কারণ প্রকৃতি কাউকে ধরে রাখেনা। 'একদিন সবাইকে যেতে হবে' —এই ধরণের একটা মনোভাব পোষ্টমাষ্টারের মনে জাগলো। মানুষের স্নেহ প্রেম একদিকে, অপরদিকে নিষ্ঠুর মৃত্যু। 'যেতে নাহি দিব' কবিতার বিদায় দৃশ্যের প্রতিফলন এই গল্পের শেষে লক্ষ্য করা যায়—

"এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্য ছেয়ে
সবচেয়ে পুরাতন কথা, সবচেয়ে
গভীর ক্রন্দন— 'যেতে নাহি দিব' হায়
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়"

এই গল্পে প্রকৃতি নিয়েছে অমোঘ বিশ্বনিয়ন্তার ভূমিকা, দুটি জীবনকে মিলিয়ে দিলেও আবার নিজের খেয়ালেই প্রকৃতি তাদের মধ্যে বিচ্ছেদও আনল- জীবন এখানে নিমিত্ত মাত্র। গল্পের শেষে পোষ্টমাষ্টারের উদাস হৃদয়ের অনুভব— 'কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু-পৃথিবীতে, কে কাহার?' এই অনুভূতির জন্যেও সেই প্রাকৃতিক পরিবেশই দায়ী।'

'পোষ্টমাষ্টার' গল্পের ভিত্তিভূমি হল প্রকৃতি, প্রকৃতিই রতনকে পোষ্টমাষ্টারের ঘনিষ্ঠ করে তুলেছিল, আবার এই প্রকৃতির জন্যই পোষ্টমাষ্টারকে এই গ্রাম থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। এই প্রকৃতি আবার অন্যরূপে এসেছে 'অতিথি' গল্পে। এখানে তারাপদ চরিত্রের মাধ্যমে প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের এক নিগূঢ় সম্বন্ধ দেখানো হয়েছে। তারাপদ সম্পর্কে গল্পকার বলেছেন, 'জন্মনক্ষত্র তাহাকে গৃহহীন করিয়া দিয়াছে।' ঋতুদের মতো, বর্ষা-শরৎ-বসন্তের মতো পৃথিবীতে তারাপদ অতিথি। বিশ্বের মর্মে মর্মে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে অনবচ্ছিন্ন সঙ্গীত, সে সঙ্গীত বাঁশীর সুরের মতো সঙ্গীতমুগ্ধ তারাপদকে একস্থান থেকে আরেক স্থানে যেন ভুলিয়ে নিয়ে যায়। কারণ তারাপদ হরিণশিশুর মতোই বন্ধনভীরু, আবার হরিণশিশুর মতোই সঙ্গীতমুগ্ধ। বিশ্বপ্রকৃতিই তারাপদের ঘর, ফলে কোন স্নেহবন্ধন তাকে বেঁধে রাখতে পারেনা। বহির্পৃথিবীর স্নেহহীন স্বাধীনতা তাকে বারবার হাতছানি দিয়ে আহ্বান করে। সে কোথাও স্থির হয়ে থাকেনা, কারো নিবিড় বন্ধনে সে বাঁধা পড়েনা। ফলে কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিবাবুর সংসারকে কেন্দ্র করে যখন তাকে মোহিনী মায়ায় চারদিকে থেকে বাঁধার আয়োজন করা হচ্ছে, সেদিনই সে জননী বিশ্বপৃথিবীর বুকে হারিয়ে গেল। এভাবে প্রকৃতির বুকে নিরুদ্দেশের উদ্দেশ্যে হারিয়ে যাওয়ার এক আকুলতা রবীন্দ্র মানসেরই প্রতিফলন, যার আর্তি 'বসুন্ধরা' কবিতাতে লক্ষ্য করা যায়— *"আমারে ফিরায়ে লহো অয়ি বসুন্ধরে, কোলের সন্তান তব কোলের ভিতরে বিপুল অঞ্চল তলে"*

যে ঐশ্বর্য্য, প্রাচুর্য্য ও সৌন্দর্য্য ধরিত্রীর বক্ষ থেকে নিঃসারিত হয়ে প্রকৃতিকে নিগূঢ় আনন্দরসে অভিষিক্ত করে লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রবাহিত হয়ে চলছে, কবি তার সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছেন। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতাবোধের এই চেতনাই 'অতিথি' গল্পে ব্যক্ত হয়েছে। বনের পাখি তারাপদ হল এই গল্পের মুখ্যচরিত্র। তারাপদ যখন মতিলালবাবুর নৌকায় ছাঁদের উপর পালের ছায়ায় আশ্রয় নিল, তখন তারই 'চিরনতুন' অশ্রান্ত কৌতুহলী চোখ দিয়ে গ্রামবাংলার প্রকৃতি ও জনজীবনের রূপচিত্র পাঠকগণও দেখতে লাগলেন— "এই জলস্থল আকাশ, এই চারিদিকের সচলতা, সজীবতা মুখরতা এই উর্দ্ধঅধোদেশের ব্যপ্তি ও বৈচিত্র্য এবং নির্লিপ্ত সুদূরতা এই সুবৃহৎ চিরস্থায়ী নির্নিমেষ বাক্যবিহীন বিশ্বজগৎ তরুণ বালকের পরম আত্মীয় ছিল, অথচ সে এই চঞ্চল মানবকে মুহূর্তের জন্যও স্নেহবাহু দ্বারা ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিত না' —এখানে প্রকৃতিকে নির্দিষ্ট করে 'সে' সর্বনাম ব্যবহার করে কবি তাকে ব্যক্তিসত্ত্বা দান করেছেন, ফলে প্রকৃতি ও তারাপদের মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকল না। নিত্যসচলা প্রকৃতির মতো তারাপদও সজীব, স্পন্দিত, প্রগলভ, আলোকে

উদ্ভাসিত, নবীনতায় সুচিক্কন, প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ, আবার প্রকৃতির মতই তার নির্লিপ্ত মুক্তস্বভাব, যার ফলে কোনো প্রেম বন্ধন বা স্নেহ বন্ধন তাকে বেঁধে রাখতে পারেনি। প্রকৃতির বৃহত্তর আহ্বান তার সুদূরের পিয়াসী মনকে ঘরছাড়া করেছে। তার প্রায় দুই বৎসরের নিবাস, চারুশশীর প্রতি ক্ষণকালীন আকর্ষণ, সমগ্র গ্রামের মুগ্ধ ভালোবাসাকে তুচ্ছ করে প্রকৃতির সন্তান, প্রকৃতির মতোই আসক্তিহীন 'অতিথি' তারাপদ চলে গেল বিশ্বজননীর কোলে।

প্রকৃতিও মানবের অনির্বচনীয় সম্পর্ক নিয়ে রচিত আরো একটি ছোটগল্প হল 'সুভা'। 'অতিথি'র তারাপদর মত 'সুভা'ও প্রকৃতিরই এক অংশ। মূক সুভা কথা বলতে পারেনা। কিন্তু, 'প্রকৃতি যেন তাহার ভাষা পূরণ করিয়া দেয়, যেন তাহার হইয়া কথা কয়।' বোবা মেয়ে সুভা মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারে না, তাই তার অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ গড়ে উঠে প্রকৃতির সঙ্গে। সে কথা বলতে না পারলেও নদীর কলধ্বনি, লোকের কোলাহল, মাঝির গান, পাখির ডাক, তরুর মর্মর— এসব ভাষা সে বুঝতে পারতো, মূক প্রকৃতি তার কাছে ছিল মুখরিত। প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকটি ভাষাহীন জীবের সঙ্গেও তার বন্ধুত্ব ছিল, দুটি গাভী-সর্বশী ও পাঙ্গুলী, একটি বিড়াল শিশু, তবে মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারে এমন একটি বন্ধুও তার ছিল, সে ছিল গোঁসাইদের অকর্মণ্য ছোটছেলে প্রতাপ।

গীতিরসে সিক্ত এই ছোটগল্পটিতে রবীন্দ্রনাথ সুভার করুণ পরিণতির চিত্র অংকণ করেছেন। প্রকৃতির এই মূক সন্তানটি তার পিতা মাতার কাছেই নয় পুরো সমাজের কাছেই ব্যতিক্রম। তার ভাষা নেই, কিন্তু বোধ আছে। ভাষা নেই বলে সে মনের কথা বোঝতে পারেনা। কিন্তু বোধ আছে বলে সকলের ইঙ্গিতই সে বোঝে। তাই পিতামাতার অসহায় অবস্থা, সমাজের সহানুভূতিহীনতা সে বোঝে এবং নদীতীরে প্রকৃতির সান্নিধ্যে ও দুটি গাভীর চোখের মধ্যে সে সান্ত্বনা খোঁজে।

সমাজের ভয়ে পিতা বাণীকণ্ঠ ছলনার আশ্রয় নিয়ে সুভার বিয়ের আয়োজন করলেন। কিন্তু সে চোখের জলে বোঝাতে চাইল যে তার এসবের দরকার নেই। সে নদীতীরে, সর্বশী ও পাঙ্গুলীর সঙ্গে প্রকৃতির উদার মাতৃবক্ষেই শুধু জীবনটা কাটিয়ে দিতে চায়। সেটুকু পেলেই সে কৃতার্থ, কিন্তু তাকে নিক্ষেপ করা হল সহানুভূতিহীনতার প্রখর উত্তাপ থেকে সহানুভূতিহীনতার অগ্নিকুণ্ডে। কারণ বিয়ের কয়দিন পরই তার স্বামী জানল যে সে ভাষাহীন, তার পরই সে সুভার ভাষাহীনতাকে নির্মম ভাবে মুখরিত করে, 'চক্ষু এবং কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া এক ভাষাবিশিষ্ট কন্যা বিবাহ করিয়া আনিল', 'বালিকার চিরনীরব হৃদয়ের মধ্যে একটা অসীম অব্যক্ত ক্রন্দন বাজিতে লাগিল— অন্তর্যামী ছাড়া

আর কেহ তাহা শুনিতে পাইল না।' মূক প্রকৃতির সঙ্গে মূক বালিকার আন্তরিক সংযোগ দেখানোই এই গল্পের মূল উপজীব্য হলেও তার মধ্য দিয়ে গল্পকার সুভার বিবাহ এবং তার ব্যর্থতার কথাও অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে অংকিত করেছেন। 'কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ'-এ অধ্যাপক নারায়ণ গাঙ্গোপাধ্যায় Wordsworth-এর রুথ চরিত্রের সঙ্গে সুভার সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

শিলাইদহ পর্বে পদ্মাতীরবর্তী গ্রামবাংলার প্রাকৃতিক দৃশ্য, সেখানকার জনপদবাসী মানব মানবীর সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা কবি প্রাণভরে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং 'গল্পগুচ্ছ'-এর এক একটি ফসল ফলিয়েছেন। 'সুভা'র কাহিনীর সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায় 'ছুটি' গল্পের কাহিনীর। প্রথমটিতে সুভাকে প্রকৃতির কোল থেকে সরিয়ে নেওয়ায় সুভার আত্মিক মৃত্যু এবং দ্বিতীয়টিতেও প্রকৃতির কোল থেকে সরিয়ে নেওয়ায় ফটিকের আত্মিক মৃত্যু ও এরপর কায়িক মৃত্যু। প্রকৃতির সান্নিধ্য প্রয়াসী, নিয়ম বিরোধী, খেয়াল খুশির সহজ জীবন প্রিয় একটি দুরন্ত কিশোর হল ফটিক। এর দুরন্তপনায় অস্থির হয়ে তার বিধবা মা তাকে মামার বাড়ী কোলকাতায় পাঠালেন লেখাপড়া শিখিয়ে ভদ্র করে তোলার জন্য। একদিকে শহুরে সংকীর্ণ জীবনধারা, অপরদিকে মামীমার গলগ্রহ বিবেচিত হওয়ায় বিষণ্ণ চিত্তে ফটিক গ্রামে যাবার জন্য অধীর হয়ে পড়ত। 'প্রকাণ্ড ধাউস ঘুড়ি লইয়া বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই নদীতীর, দিনের মধ্যে যখন তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সংকীর্ণ স্রোতস্বিনী, সেই সব দল-বল উপদ্রব স্বাধীনতা এবং সর্বোপরি সেই অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা অহর্নিশি তাহার নিরুপায় চিত্তকে আকর্ষণ করিত।"

কবি বলছেন, "তের চৌদ্দ বৎসরের বালকের ন্যায় এমন বালাই আর নাই, তার শোভাও নাই, সে কাজেও লাগেনা।" কিন্তু এইসব বালকের 'বসুধৈব কুটুম্বকম'। ফটিক ছিল গ্রামের সমস্ত ছেলের সর্দার, যখন গ্রামের ক্ষুদ্র গণ্ডিছেড়ে যাবার সম্ভাবনা আসল তখন বাইরের পৃথিবী দেখার আকাংখায় সে রাজী হয়ে গেল। তার ছিপ, ঘুড়ি, লাটাই, পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ করার জন্য তার ছোট ভাই মাখনকে সে দিয়ে গেল। রাস্তায় খালাসীদের কাজকর্ম তার মনে গভীর ছাপ রেখে গেল। কিন্তু কলকাতার রুদ্ধ হাওয়ায় এই স্বাধীনচারী বালকের হৃদয় মুষড়ে গেলো। পল্লীগ্রামের উন্মুক্ত ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতায় যে বালকের চিত্ত পরিপুষ্ট হয়েছিল, কলকাতার সংকীর্ণ গলির স্কুলে সে ভালো ছেলে হতে পারলো না। সে মামার বাড়ী থেকে পালিয়ে গেল। শ্রাবণ মাস, মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে, অসুস্থ ফটিককে পুলিশ মামার বাড়ীতে ফিরিয়ে আনল, তখন ঝুপ ঝুপ করে অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তায় এক হাটু জল। ফটিকের সঙ্গে প্রকৃতিও যেন

বিপর্যস্ত। জ্বরের ঘোরে বিশাল জলপ্রবাহের জল মাপছে মৃত্যুপথযাত্রী ফটিক। তার শেষ উক্তি 'মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ী যাচ্ছি।' এই 'ছুটি' শব্দে এক বিপুল অবকাশের ইঙ্গিত রয়েছে। গ্রামের মাঠে মাঠে ফটিক যে অন্তহীন অবকাশের জীবনকে পিছনে ফেলে এসেছে, সেই প্রসারিত প্রান্তরের মত ছুটি শব্দটির অর্থও যেন বিপুল ভাবে প্রসারিত হয়েছে। প্রকৃতির সন্তান এই কিশোরকে সভ্য করতে গিয়ে তার স্বভাবের উপর কৃত্রিম সভ্যতার যে নিষ্পেষণ চালানো হল এর ফল হল তার মৃত্যু। যখন তাকে প্রকৃতির সম্পর্কচ্যুত করা হল তখনই তার আত্মিক মৃত্যু হল তখন কায়িক মৃত্যুও বেশী সময় নিলনা।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি বিষয়ক ছোটগল্পগুলি গড়ে উঠেছে মানবজীবন ও প্রকৃতির টানাপোড়েনে। একটি সূত্র আসে মানুষের সুখ-দুঃখ থেকে আর একটি সূত্র আসে প্রকৃতি থেকে। প্রকৃতিকে বাদ দিলে ছোটগল্পের অনেক গল্পই গল্পের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। যেমন খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', এই গল্পের ভিত্তি রহস্যময় পদ্মার রাক্ষুসী ক্ষুধা। এই গল্পে বর্ষার ভরা ভয়াল পদ্মানদী মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এখানে প্রকৃতি শুধু পটভূমি রচনা করেনি, সজীবতা লাভ করে গল্পে নাটকীয়তা এনেছে। 'ক্ষুধিত পদ্মা উদ্যান, গ্রাম, শস্যক্ষেত্র এক এক গ্রাসে মুখে পুরিতে লাগিল। বালুকাচরের কাশবন এবং বনঝাউ জলে ডুবিয়া গেল। পাড় ভাঙার অবিশ্রান্ত ঝুপঝাপ শব্দ এবং জলের গর্জনে দশদিক মুখরিত হইয়া উঠিল এবং দ্রুতবেগে ধাবমান জলরাশি নদীর তীব্রগতিকে প্রত্যক্ষ গোচর করিয়া তুলিল।' 'ক্ষুধিত' এই বিশেষণটি প্রয়োগ করে অচেতন পদ্মাকে চেতনা দান করা হয়েছে। পাড় ভাঙার শব্দে যেন পদ্মা আরো সজীবতা লাভ করেছে। এছাড়াও দ্রুতবেগে ধাবমান জলরাশি ভেসে যাওয়ায় নদীর গতিবেগও পাঠকের চোখে অংকিত হয়ে যায়, পদ্মা যেন সশব্দে চলমান একটি সজীব জান্তব প্রকৃতি। যার তীব্র ক্ষুধা অনুকূলচন্দ্রের পুত্র নবকুমারকে গ্রাস করেছিল। বর্ষার ভরা নদীর ছল ছল খলখল করে বয়ে যাওয়া জল দেখে মানবশিশুর মন চঞ্চল হয়ে উঠারই কথা, পরিণামে দুরন্ত জলরাশি মানবশিশুটিকে অস্ফুষ্ট কলভাষায় তাদের কাছে ডেকে নিল। রাইচরণ যখন তার ক্ষুদ্র মনিবের জন্য আঁচল ভরে কদম্ব ফুল নিয়ে এলো তখন খোকাকে না দেখে তার রক্ত হিম হয়ে গেল। তার 'খোকাবাবু', 'আর্তডাকের উত্তরে 'চন্ন' বলে কেউ সাড়া দিল না। কেবল পদ্মা পূর্ববৎ ছল ছল খল খল করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, যেন সে কিছুই জানেনা এবং পৃথিবীর এই সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তার যেন এক মুহূর্তও সময় নেই।

'সমাপ্তি' গল্পের পটভূমিতেও শ্রাবণ মাস। এই গল্পের মৃন্ময়ী চরিত্রের মধ্যে

প্রকৃতির একটা স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ রূপ অংকিত হয়েছে। প্রকৃতির সন্তান সে, তাই প্রকৃতির মতই সে দুরন্ত, চঞ্চল ও বন্য স্বভাবের অধিকারিনী ছিল। অপূর্বর ভালবাসার চেয়ে প্রকৃতির মুক্ত আবেষ্টনই তার কাছে অধিকতর প্রিয় ছিল। এই চরিত্রটির উপাদান কবি খুঁজে পেয়েছিলেন অনেকগুলি জনপদবধূর ভিড়ের মধ্যে থেকে— একথা কবির একটি পত্রে জানা যায়।

সীমিত পরিসরের জন্য মাত্র কয়েকটি গল্প নির্বাচন করে কবির প্রকৃতি প্রেমের পরিচয় তুলে ধরা হল। শুধু 'ছুটি', 'সুভা'ই নয় 'গল্পগুচ্ছ'-ই নয়, সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্যে, তাঁর সমস্ত শিল্পকর্মে প্রকৃতি এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। প্রত্যেক স্থানেই প্রকৃতিকে ব্যবহার করা হয়েছে শিল্পকর্মটিকে ব্যঞ্জনাময় করে তোলার জন্য। কোনো স্থানে অপ্রয়োজনে কবি প্রকৃতিকে ব্যবহার করেননি, বক্তব্য বিষয়কে স্পষ্টকরে ব্যক্ত করার জন্যই প্রকৃতির উপস্থাপনা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করছি, প্রমথনাথ বিশী তাঁর 'শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে বলেছেন যে ঠাকুরবাড়ীর জমিদারী নদীময় বঙ্গে না হয়ে যদি বাঁকুড়াও পুরুলিয়ার নদীবিরল উষর অঞ্চলে হত তাহলে স্থানের রূপান্তর রবীন্দ্র সাহিত্যে কী রূপান্তর সাধন করতো তা অবশ্যই আলোচনার অপেক্ষা রাখে। যাই হোক, কলকাতার নাগরিক সন্তান রবীন্দ্রনাথকে নদীমাতৃক বাংলাদেশের এই পল্লীপ্রকৃতিই মহাকবির পদবী দান করেছিল।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

গল্পগুচ্ছ ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ছিন্নপত্র ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
উনবিংশ শতাব্দীর গীতিকবিতার সংকলন ঃ শ্রীশ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীঅরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা ঃ নীহার রঞ্জন রায়
কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ ঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ ঃ প্রমথ নাথ বিশী
রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি চেতনা ঃ ডঃ জীবন কুমার মুখোপাধ্যায়
বাংলা ছোটগল্প সমীক্ষা ঃ হীরেন চট্টোপাধ্যায়
ছিন্নপত্রের রবীন্দ্রনাথ ঃ হীরেন চট্টোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথ ঃ সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত
উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণ ও রবীন্দ্রনাথ ঃ ডঃ অসিত কুমার দত্ত
সাহিত্যিকা ঃ ডঃ সুবোধ চৌধুরী

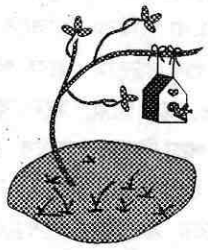

বিবর্তন

(মূল লেখক ঃ শীলভদ্র)

অনুবাদ ঃ ড০ সুনন্দা দাস

পোকা-মাকড় দেখলেই দীপ্তি ভয়ে-আতংকে কেঁচো হয়ে যায়। রমেন ভাবে, ও বেশী বেশী করে। ভয় না ছাই, ভয়ের অভিনয়। 'ধরলো, ধরলো, কি করে তোমাকে ধরে দেখি তো' বলে একটা আরশোলা দীপ্তির গায়ে ছুড়ে মারে রমেন। ভয়তরাসে, তীক্ষ্ণ চিৎকার করে দীপ্তি চেতনা হারায়। নীলবর্ণ হয়ে ওঠে ওর ঠোঁটদুটো। এই অবস্থা দেখে রমেন শঙ্কিত হয়ে পড়ে।

শুঁয়োপোকা দেখলেই দীপ্তির শরীরে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। আজকাল ওর এসব কিছুই হয়না। রমেন বুঝতেই পারেনা শহরে এতো শুঁয়োপোকার আমদানি কি করে হলো। চতুর্দিকে শুঁয়োপোকা আর শুঁয়োপোকা। প্রকাণ্ড বড়ো বড়ো একেকটা, লম্বায় আঢ়াই থেকে তিন ইঞ্চি হবে। দেয়াল, মেঝে, চেয়ার, টেবিল, সেলাই কলের ওপর দিয়ে শরীরে ঢেউ খেলিয়ে ভীষণ ব্যস্ততায় চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কত আর মেরে শেষ করা যায়। দীপ্তি আজকাল সে চেষ্টাও ছেড়ে দিয়েছে। কারণ মারার পর এদের শরীর থেকে যে কশ বের হয় তার দুর্গন্ধে আবার হাজার হাজার শুঁয়োপোকারা বেরিয়ে এসে কালো কালো স্তূপের মতো জমাট বাঁধে।

শহর থেকে কাক পক্ষী অদৃশ্য। কোথায় গেল সব? মরল নাকি? কেবল শুঁয়োপোকা আর গুবড়েপোকা। আকারে দেখলে এদের গুবড়ে পোকা বলে মনে হয়না, আকারে যেমন বড়ো তেমনই শক্ত। আগে দিনের বেলা দেখাই যেতোনা। সন্ধ্যে হতেই কোথা থেকে যে দলে দলে বেড়িয়ে আসে। শুরুতে খোলাগুলি জুতার চাপে মট্‌মট্ করে ভেঙে যেতো। কিন্তু এখন খোলাগুলি আকৃতিতে যেমনি বেড়ে গেছে তেমনি শক্ত হয়ে গেছে। মুখের সামনে লম্বা লম্বা শুং। মানুষের উপস্থিতি টের পেলেই শুংসহ মুখ খোলের ভেতর টেনে নিয়ে গোলাকার লোহার বলের আকৃতি নেয়। হাতুরী পিটিয়েও এদের কব্জা করা যায়না। সূচকীয় অনুপাতে এদের বৃদ্ধি দিনে দিনে বেড়েই চলছে।

বেশ কিছুদিন থেকে শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ। রমেন বরুয়া সারারাত

দু'চোখের পাতা এক করতে পারেনি। কি প্রচন্ড গরম! ওকে কে যেন প্রেসার কুকারে সেদ্ধ করছিল। পাশের শয্যায় দীপ্তিরও একই অবস্থা, সদ্যজল থেকে তুলে আনা মাছের মতো দীপ্তি কাঁতরাচ্ছে।

ভোরের আলো না ফুটতেই, হাঁপাতে হাঁপাতে রমেন জলের বালতি একটা কলের নীচে বসিয়ে এলো। কলের জলও বন্ধ হবার উপক্রম। চারদিকে সাংঘাতিক রকমের অনিয়ম। জল সরবরাহের কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। কখনো ভোর পাঁচটায়, আবার কখনো এলোই না। হঠাৎই আটটার সময় হয়তো দুই-ফোঁটা পড়লো সূতার মতো সূক্ষ্ম ক্ষীণ ধারায়। আবার বন্ধ। কিছুসময় পর আবার দুই এক ফোঁটা, আবার বন্ধ। এইভাবে খেলা কিছু সময় চলার পর, একেবারেই বন্ধ। এই করে বালতিতে কয়েক ইঞ্চি জল জমা হলো। জলতো, যেমনি তার রঙ হোক না কেন।

রোদ উঠলে কার সাধ্য বাইরে তাকায়। অনেক রকমের ঘনত্বও সংকটজনক বিশিষ্ট গ্যাস ভেদ করে আসার ফলে আলোকরশ্মি স্পেক্ট্রামের মতো অস্থিরভাবে কাঁপতে থাকে। দৃশ্যমান বস্তুজগতকে তীব্রতাসহ আলোক বলয় ঢেকে রাখাতে মনে হয় কোনো জিনিষেরই কোনো নির্দিষ্ট বা অপরিবর্তিত রূপ নেই। 'জয়বাংলা' হওয়া মানুষ আকাশে আলোর দিকে তাকালে যে অস্বস্তি বোধকরে ঠিক তেমনি অবস্থা। তবে সে কষ্ট থেকে এই কষ্টের মাত্রা হাজার গুণ বেশি। সূর্যের আলোও যেন বিষাক্ত হয়ে গেছে।

ঘরের ভিতরেও শান্তি নেই। রমেন ভাবে, পিপড়াদের মতো মাটির তলার একটা গহ্বরে ঢুকে থাকতে পারলে বোধহয় আরাম পাওয়া যেতো। নিজের অজান্তে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা করে। বাতাস নেই, নিঃশ্বাস বন্ধ হবার জোগাড়। আজ আর রমেনের কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই, শুধু চাই, একবারের জন্য বুকভরা মুক্ত নির্মল বাতাস। কিন্তু কোথায়! অজানা ভয়ে সে আতংকিত হয়ে ওঠে। আবার শুরু, কুয়াশার মতো ঘন গ্যাস কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে ধীরে ধীরে নেমে আসছে। মুহূর্তের মধ্যে চারদিকে একটা আতংকের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। কুকুরগুলো চিৎকার আরম্ভ করে দেয়। স্বাভাবিক আওয়াজ নয়, অনেকটা সাইরেনের মতো ধারাবাহিক বিলাপ। আতংক ও হতাশার জীবন্ত প্রকাশ! বিরক্তি ও হতাশায় রমেন দা একটা নিয়ে বাইরে বের হতে গেলে দীপ্তি ওর হাত ধরে টেনে আনে, বলে— 'কি করো? কোথায় যাও?'

চন্দ্রাতপের মতো গ্যাস মাটি থেকে কিছু উপরে মেঘের মতো নিশ্চল হয়ে ভাসতে থাকে। শুধু গ্যাসই নয়, চারদিকে একটা থমথমে পরিবেশ। এক অনিশ্চয়তাও আতংকের বাতাবরণ।

এরপর হঠাৎই শুরু হয়ে যায়

ঝড়, বালি ও কাঁকরের ঝড়। ভয়ংকর ও অবিরামভাবে হঠাৎ যেভাবে শুরু হয়েছিল আবার সেভাবেই হঠাৎই বন্ধ হয়ে যায়। আধমরা যে কটা গাছ বিশৃঙ্খল ও এলোমেলো অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল তার থেকে আরো কিছু পড়ে গেল, গাছ আর নেই বললেই চলে, নতুন করে যে কয়টা গাছ জন্মেছে, তাদের গাছ বলা চলে না, গাছের প্রহসন। লতার মতো লিক্‌লিকে, এতো নরম যে হাত দিয়ে টেনে তুলে ফেলা যাবে।

রমেন আর দীপ্তি মরনাপন্ন রোগীর মতো মুখ দিয়ে প্রাণপণে নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা করে। সামান্য বিষয় নিয়ে, কখনো বা বিনা কারণে দুজনে জন্তু জানোয়ারের মতো পরস্পরকে আক্রমণ করতে থাকে। একজন অন্যজনকে মেরে ফেলতেও পারে। কিন্তু শক্তিহীনতার অভাবে বেশী সময় ধরে মারামারি করার ক্ষমতাও নেই। সামান্য একটু বাতাসের জন্য হা পিত্যেশ করা অবস্থায়ও একজন আরেকজনকে তীব্র ঘৃণার দৃষ্টি দিয়ে বিদ্ধ করতে চায়।

আজকাল আকবরের সরোদ বা বিসমিল্লাখানের সানাইয়ের আওয়াজ শুনলে ওরা যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠে। রমেনের জীবনের একমাত্র বিলাসিতা ছিল বই কেনা। বাইরে বেড়াতে গেলে লোকে কাপড়-চোপড় কেনে, ইলেক্ট্রনিস জিনিষ কেনে, রমেন শুধু বইকেনে। কাঠমুন্ডু বেড়াতে গিয়ে সে জাপানী কেমেরার খোঁজ করেনি, দেশে না পাওয়া বিদেশী বইয়ের খবর করেছিল। আর এখন নিজের সংগৃহীত বইয়ের দিকে তাকিয়ে ভাবে এগুলো কি? দীপ্তি ওর সেতারের দিকে তাকিয়ে বোঝবার চেষ্টা করে, এটাই বা কি?

কিছুদিন থেকে রমেনের সমস্ত যন্ত্রণার উপশম হতে শুরু করেছে। দীপ্তিরও কষ্টের কিছুটা লাঘব হয়েছে। বহুদিন পর রমেন স্বাভাবিক ভাবে দীপ্তির দিকে তাকায়। নিজের চোখ দুটোকে বিশ্বাস হয়না। দীপ্তির সারাশরীর কালো কালো লম্বা লোমে ভর্তি। কোথায় দীপ্তি! একটা প্রকান্ড শুঁয়োপোকা।

যন্ত্রণার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার সঙ্গে সঙ্গে দীপ্তি রমেনের দিকে তাকায়। রমেনের গায়ের চামড়া এতো শক্ত হয়ে গেছে যে ওকে আর রমেন বলে চেনাই যায় না। কোথায় রমেন! এতো বিরাট একটা গুবড়ে পোকা।

একাত্ম অনুভব

—মলিনা চৌধুরী
অতিথি লেখিকা

একটি গল্প নাকি লিখতে হবে, দিতে হবে। কি লিখব? আমার জন্ম একটি গল্প, আমার জীবন একটি গল্প। শুধু গল্পই নয়— বৃহৎ গল্প, একটি উপন্যাস, মাত্র নায়ক আমি। যাক ওসব কথা, আজ আর কিছু লিখছিনা। পরে কখনও হবে আমার কথা।

এখন নাহয় আমাদের ঘরের পাশে থাকা, ভাঙ্গা, ফুটো হয়ে যাওয়া চাল থাকা ঘরের গল্প একটিই বলি।

বিয়ের পর অনেক অনেক দিন চলে গেলো বাচ্চা হলোনা ওদের। মা-বাবা হবার ইচ্ছেটা যখন শেষ হয়ে আসছে ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। ভগবানের কৃপাদৃষ্টি পড়লো করুনা আর কামিনীর উপর।

হুঁ, ভালো গল্পকার আমি। ওদেরতো পরিচয় ই দিলাম না। আমার তিনতলা বিল্ডিং এর ছাদ থেকে নিচের দিকে তাকালে প্রায় আমাদের দেয়াল ঘেসে কয়খানা চালা ঘরের একটি ঘরের কাহিনী এটা। ঘরের বাসিন্দা দুজন। স্বামীর নাম করুণা, স্ত্রীর নাম কামিনী। স্বামী করুণা শহরের বড় বাসষ্টেণ্ডে একটা হোটেলে কাজ করে, স্ত্রী কামিনী আমাদের ঘরে, আরও দু এক ঘরে বাসন ধুয়ে, কাপড় ধুয়ে কাজ করে দিন পার করে।

যাহোক, ভগবানের তো কৃপা লাভ ওদের হলোই। হলো তো হলো একটি ছেলের জন্ম হলো। মহা আনন্দ। কষ্ট হয়েছিলো ঠিকই, তবু ও ছেলের জন্ম হওয়াতে সব কষ্ট যেন ওরা ভুলে গেলো। করুণা আর কামিনী দুজনের জমানো টাকা যা কিছু ছিলো সব কিছু ছেলের জন্মের সময়ে হাসপাতালে দিতে হলো। কতো স্বপ্ন ওদের দুজনকে ছুঁয়ে গেলো। দুজনে মিলে অনেক স্বপ্ন রচনা করলো। ছেলে একটু বড় হলেই চায়ের দোকানে রেখে কাজ শেখাবে। আর একটু বড় হ'লে পর বাবা কাজ করা হোটেল ঢুকিয়ে দেবে। তারপর ..... তারপর আরও একটু যখন বড় হবে আদাবারিতেই একখানা ভাতের হোটেল খুলে দিতে বলবে ছেলেকে। তখন আর কোনো কষ্ট থাকবে না।

হাসপাতাল থেকে তিনদিন পর ছেলেকে নিয়ে করুণা-কামিনী যখন ঘরে এসে পৌঁছুলো পাশাপাশি থাকা মানুষ

ভীড় করে আসলো। অবশ্যই স্ত্রীলোক কয়েকজন বাচ্চাকে আদর করে, কেউবা উপদেশ দিয়ে গেলো, আবার কিছু মহিলা কামিনীর ছেলের মা হওয়ার গর্বের কথা মনে মনে চিন্তা করে ঈর্ষাবশতঃ কিছু না বলেই গেলো। যা হোক একসময় সকলেই ঘরে ফিরে গেলো। করুণার সেদিন অনেক পরিশ্রম হ'লো। বাবা হওয়ার পুরস্কার। বৃষ্টি কাঁদায় এতো কর্ম করে ও করুণার মনে কোন ও কষ্ট হলো না। বরঞ্চ আবার ভাত বানালো। কামিনীকে খাওয়ালো, নিজে খেলো। ছেলেকে বুকের মাঝে নিয়ে মা কামিনী গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়লো। করুণা ও ছেলের মুখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে, পিতৃত্বের পূর্ণতা বুকের মাঝে অনুভব করে, কামিনীর দিকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে, ছেলেকে মাঝে রেখে ঘুমিয়ে পড়লো।

আজকের দিনটি খুব ভালো কাটলো। তিনজনই গভীর ঘুমে নিদ্রিত। হঠাৎ ই কি যেন শব্দ একটা হলো। করুণার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। উঠে বসে বুঝতে চেষ্টা করলো। গরীব, দুঃখী লোক, হারিকেন জ্বলিয়ে ঘুমিয়েছিলো, কেরাসিন তেল শেষ হওয়াতে সেটাও নিভে গেছে। উপায় নেই। বিছানা থেকে নামতে গিয়ে শরীরটা হঠাৎ হাল্কা হয়ে গেলো— করুণা শক্ত মাটিতে না পড়ে জলে পড়ে গেলো। হঠাৎ করে ও কিছুই বুঝতে পারলো না। হাত বাড়িয়ে বিছানাতে শুয়ে থাকা কামিনী আর ছেলেকে খুঁজলো— না কেউ নেই বিছানায়। ছেলেও নেই কামিনীও নেই। বাইরে কী ভিতরে বুঝা যায় না, শুধু মানুষের চিৎকার আর কোলাহল। পাগলের মতো করুণা ও চিৎকার করে উঠলো। কি বললো নিজেই বুঝতে পারলো না। চারদিকের বিল্ডিং গুলো থেকে মানুষ যতোটুকু পারছে আলো ফেলে সহায় করতে চেষ্টা করলো.....।

একটা সময় রাত শেষ হ'লো। আমাদেরও ঘুম আসলো না। ভোর হ'তে না হতেই উপর থেকে দেখলাম। ভাঙ্গা ঘরগুলো আরও ভেঙ্গেছে। মাটির সঙ্গে মিশেছে। জল সব কিছু একাকার করে দিয়েছে। কামিনীদের ঘর যেখানে ছিলো, তাকালাম, চালের টুকরো মাটিতে পড়ে আছে। বন্যার জল ওদের সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। প্রায় দৌড়ে নেমে গেলাম। জল ডিঙিয়ে, কাদা মাড়িয়ে ভেঙ্গে যাওয়া ঘরগুলোর দিকে এগিয়ে গেলাম। সকলেই নিজের লোককে ব্যস্ত হয়ে খুঁজছে, আমি কামিনীদেরকে খুঁজলাম। কোথা ও পেলাম না। মনটা খারাপ হয়ে গেলো। ঘরে আসলাম, চান করে বসে থাকলাম। আমার স্ত্রীর বারবার অনুরোধ সত্বেও খাবার খেতে পারলাম না।

গল্পটা আবার এখানেই শেষ হলো না। প্রায় এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলো

সেদিনের দুর্যোগ রাতের। করুণা আর কামিনী ছাড়া প্রায় সকলেই আবার ঘর বানিয়েছে। আমি সকালবেলা ছাদের উপর থেকে করুণাদের জায়গাটা দেখলাম। দেখলাম কেউ যেন কিছু খুঁজছে। করুণার মতো লাগলো। নিচে নেমে গেলাম। হাঁ করুণা-ই, করুণাকে দেখে করুণা হ'লো। ওকে ডাকলাম। এক অবুঝ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো। জিজ্ঞেস করলাম— কি খুঁজছো। কিছুই যেন হয়নি। করুণা নাগাড়ে বলে গেলো ছেলেকে ঘরে নিয়ে আসার সুখের, শান্তির, গর্বের কথা। বলেই চললো..... বলেই চললো..... পাগল নামে আখ্যা পেলো। নাজানি কোন নদীর বাঁধ ভাঙ্গা জল ওদের সুখী গৃহকোণকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো।

আমি লেখক নই। কখনও কখনও একটু আধটু লিখি। করুণার এই কাহিনী কখনও গল্প হিসেবে লিখবো বলে ভাবিনি। কিন্তু আমার অনুভুতি ওর অনুভুতির সঙ্গে এতো একাত্ম হয়ে গেলো যে আমি করুণার কাহিনী না লিখে পারলাম না।

করুণা, তুমি তোমার স্ত্রী পুত্রকে হারিয়ে, পাগল হয়ে রাস্তা-ঘাটে ঘুরছো, অনবরত ওদেরকে খুঁজছো। আমি প্রার্থনা করি খুব তাড়াতাড়ি ভগবান তোমাকে ওনার চরণে স্থান দিন। তোমার স্ত্রী, পুত্রের আত্মার সদ্‌গদি হোক। এই-ই আমার প্রার্থনা। ঈশ্বরের অসাধ্য কিছু নেই। যদি তুমি কখনও সুস্থ হয়ে উঠো— আর আমার কপাল বিড়ম্বনাতে এই লেখাটা তোমার চোখে পড়ে, আবার যদি তুমি কষ্ট পাও, আমাকে ক্ষমা করে দিও। আমিও তোমার ব্যাথার সমব্যাথী। আমার ছোটবেলাতে এই রকম অদ্ভুত এক বন্যা এসে আমার মা, বাবা, ভাই বোন সবই কে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। আমিও একা.....☯☯

মহৎ বাণী—

(১) "বিদ্বান, চরিত্রবান, গুণবান সন্তানই মায়ের শ্রেষ্ঠ অলংকার"
—ভগবতী দেবী (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মাতা)

(২) "সত্যের জন্য সব কিছুকে ত্যাগ করা চলে, কিন্তু কোনো কিছুর জন্য সত্যকে ত্যাগ করা চলেনা।" —স্বামী বিবেকানন্দ।

সংগ্রাহক ঃ শরদিন্দু চৌধুরী

আঁধার

—সুনন্দা দাস
বিভাগীয় প্রধান

সন্ধ্যা তারা জ্বলতেই
নিভে দিগন্তের আলো
ভোরের প্রতীক্ষায়
কাটে রাত।
রাত পার হয়....
মনের আধার!
ঘোঁচেনা।

আমার বাসনা

—পাপড়ি দে
স্নাতক প্রথম বর্ষ

মনে হয় উড়ে যেতে
প্রজাপতির পাখনা ধরে,
দূর পাহাড়ের সীমান্তে।

মনে হয় উড়ে যেতে
সংসারের এই শিকল ছিড়ে,
দূর দুনিয়ার শেষ প্রান্তে।

নেই যেখানে হিংসা
রয়েছে যেখানে ভালবাসা
শান্ত স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না রাতে,

ছোট জোনাকির পিছু গিয়ে
নতুন নতুন ভাবনা নিয়ে
প্রেমের শীতল ছোঁয়া পেতে।

যদি ঘুম না আসে

—অরুনাভ ঘোষ
প্রাক্তন ছাত্র

মাঝরাতে,
যদি ঘুম না আসে,
জানালায় উঁকি মেরে
চাঁদ দেখতে ইচ্ছে হয়।
কিন্তু এ্যঙ্গেল মেলেনা।
এপাশ ওপাশ ঘুরে
চাঁদ দেখার ইচ্ছেটা
বুকের খাঁচায় ডানা ঝাপটায়
অনেকক্ষণ কেটে যায়, নির্ঘুম
হৃদয় দরজায় দাড়ায়,
তোমার মুখচ্ছবি
চাঁদের সঙ্গে অভিন্ন
....
কখনও শব্দ কখনও নৈঃশব্দ
এসে হানা দেয় অসহায় চেতনায়
ভোরের এখনও অনেক দেরী।
তখন আমিও চাঁদের সঙ্গে অভিন্ন।
চোখের দুফোটা জল গাল বেয়ে
বালিশের বুকে চুমু দেয়।
তোমার কথা মনে পড়ে
তোমার কথা? নাকি আমার কথা?
আসলে, আমরা দুজনেই যে চাঁদের
সঙ্গে অভিন্ন
হেমন্তের মরা চাঁদ।

প্রণাম জানাই

—সুনীতা দত্ত
সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়
স্নাতক ১ম বর্ষ

বহু প্রতীক্ষার পর হলো দেখা,
মিলন হলো মধুর দৃষ্টির সাথে;
স্নেহ মমতায় ভরা মুখখানি,
বহু প্রতীক্ষার পর এলো কাছে।

তোমার দুচোখ স্নেহ করুণায় ভরা।
অনেক দিনের চেনা মমতার ফল্গুধারা।

কিন্তু,
জানি তোমায় পাবো ক্ষণিকের তরে,
প্রার্থনা,
হৃদয়ে যেন নিত্য অনুভব করি তোমারে,
জানাই,
তোমায় অন্তরের সশ্রদ্ধ প্রণামখানি,
কারণ,
তুমি যে আমার অতি প্রিয় দিদিমণি।

নিরালার কবিতা

—শরদিন্দু চৌধুরী
প্রাক্তন ছাত্র

জীবনের বহু কাল আমি কাটিয়েছি অবহেলায়,
আজ একা বসে ভাবি নিঝুম সন্ধ্যাবেলায়।
জীবনে আমি করেছি অনেক ভুল,
হয়তো তাই পাচ্ছিনা খুঁজে কুল।
সময়ের করেছি আমি অপব্যয়।
তাই আজ রয়েছি ভিখারীর ন্যায়।
করার রয়েছে অনেক কিছু বাকি,
কিন্তু হায়! সময় আজ আমাকে দিয়েছে ফাঁকি।

তুমি

—শরদিন্দু চৌধুরী
প্রাক্তন ছাত্র

হৃদয় ভাঙ্গো তুমি...
তবুও তোমার দোষ কি?
দেখা হলে মুখ লুকাও
তাতে তোমার দোষ কি?
তুমি আমায় বানিয়ে অচেনা
এই জগৎকে কর চেনা।
কখনো তুমি, কখনো তোমার ছায়া
মনে হয় সবই যেন একমায়া,
আজও আমার এই জীবন,
রয়েছে তোমার ভুলে যাওয়া একমন।

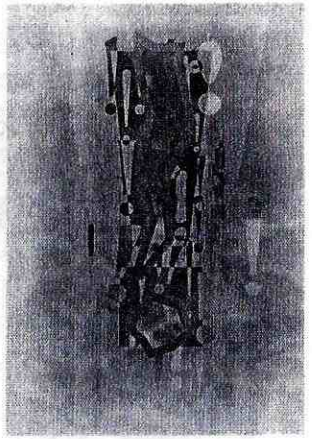

ভোমরা

—প্রিয়ঙ্কা চৌধুরী
স্নাতক তৃতীয় বর্ষ

গুণ গুণ ভোমরা
উড়ে উড়ে যায়।
ফুলের উপরে বসে
খুঁটে খুঁটে খায়।
কুর কুর, ফুর ফুর
এই যাওয়া আসা
ফুলকে বিলিয়ে দেয়
তার ভালোবাসা।

বাংলা বিভাগের দ্বারা আয়োজিত বাংলা কবিতার আলোচনাচক্র
৬ ই জানুয়ারী ১৯৯৫ বিশেষ বক্তা পদ্মশ্রী নীলমণি ফুকন।

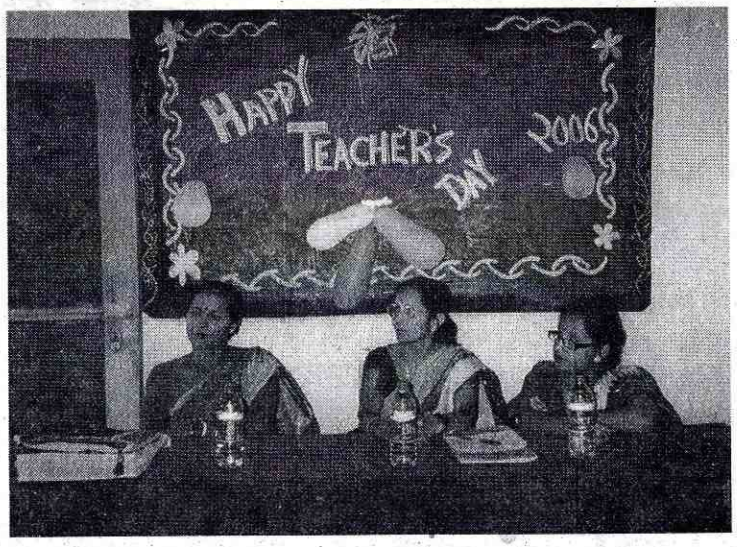

বাংলা বিভাগে শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন, ২০০৬